International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-V, September 2023, Page No.56-70
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i5.2023.56-70

মানবেন্দ্রনাথ রায় ও জাঁ পল সার্ত্রের দর্শনে মানবতাবাদ: একটি তুলনামূলক আলোচনা

দেবাশীষ ঘোষ
স্নাতকোত্তর, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ,ভারত

Abstract

Manabendranath Roy and Jean-Paul Sartre were undoubtedly the major and influential figures of contemporary philosophy of the 20th century. In this research paper, I will try to compare their humanistic thinking. From their comparative discussion it is clear that both are representative thinkers of their era. They have important contribution to people and society. Ray and Sartre both represent two different cultures and societies of the world. They both are very different from each other. The culture, nature, manners, lifestyle were completely different. It is a very difficult task to compare two great philosophers because of two different cultures, social backgrounds and different circumstances, but comparing their thoughts as well as their philosophical beliefs will certainly be interesting and useful.

Keyword:-Man, Freedom, God, Religion, Human Nature, Influence of Karl Marx, Realistic.

মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং জাঁ-পল সার্ত্র নিঃসন্দেহে বিংশ শতাব্দীর সমসাময়িক দর্শনের প্রধান এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এই গবেষণাপত্রে তাঁদের মানবতাবাদী চিন্তাধারার তুলনামূলক আলোচনা করার চেষ্টা করবো। তাদের তুলনামূলক আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে দুজনেই তাদের যুগের প্রতিনিধি চিন্তাবিদ। মানুষ ও সমাজের প্রতি তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। রায় এবং সার্ত্র দুজনেই বিশ্বের দুটি ভিন্ন সংস্কৃতি এবং সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। তারা দুজনেই একে অপরের থেকে খুব আলাদা। সংস্কৃতি, প্রকৃতি, আচার-আচরণ, জীবনযাপন সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। দুটি ভিন্ন সংস্কৃতি, সামাজিক পটভূমি এবং ভিন্ন পরিস্থিতিতে থাকার কারণে এমন দুই মহান দার্শনিকের তুলনা করা অনেক কঠিন কাজ, কিন্তু তাদের চিন্তার পাশাপাশি তাদের দার্শনিক বিশ্বাসের তুলনা করা অবশ্যই আকর্ষণীয় এবং উপকারী হবে।

মানুষ এই মহাবিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শুরু থেকে আধুনিক চিন্তাবিদদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মানুষের প্রকৃত স্বরূপকে জানা এবং তার সমস্যাগুলিকে অতিক্রম করা। মানুষের সাথে সম্পর্কিত ধারণাগুলি গঠিত হয়েছে। আর ধারণাগুলি এমনভাবে প্রচলিত আছে যেন মনে হয় মানুষই মহাবিশ্বের কেন্দ্র। যদি মানুষ না থাকত তাহলে এই সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র, শাসন, আচার-আচরণ, ধর্মের নৈতিক মূল্যবোধের কোনো মানে থাকত না। মানুষই তাদের অর্থ দেয়, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে মানবজাতি সংকটের মধ্যে অবস্থান করছে। সমাজে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা, শোষণ, জাতি বিদ্বেষ,সাম্প্রদায়িকতা, দারিদ্র্য, ধর্মীয়

উন্মাদনা ইত্যাদির কারণে সমাজে মানুষের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। সারা বিশ্ব বিভিন্ন সমস্যা ও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন। সমাজ বৈচিত্র্য ও জটিলতায় পরিপূর্ণ, যার ফলশ্রুতিতে মানুষের মনে তিক্ততা, সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষের জন্ম হয়েছে। মানুষের অস্তিত্ব তার জীবনের মান ও আচার-আচরণ নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ সবসময় উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম করে আসছে। কিন্তু আজকের যান্ত্রিক বা অতি-আধুনিক জীবনে এটি এতটাই ব্যস্ত যে এর আসল প্রকৃতি ও জীবনের উদ্দেশ্যও জানে না। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, নৈতিক আচরণ, মানবিক মূল্যবোধ তার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন পরিস্থিতির কারণে মানবজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

রায় এবং সার্ত্র উভয় দার্শনিকই কেবল ব্যক্তিগত এবং সামাজিক স্তরে এই সংকটময় পরিস্থিতিগুলি নিয়েই চিন্তা করেননি, বরং একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ চিন্তাবিদ হিসাবে তাদের পথ দেখিয়েছেন, একজন ওয়ার্কাহোলিক হয়েও এই পথগুলি অনুসরণ করেছেন, উভয় দার্শনিকই মানবতাবাদের সমর্থক। এবং মানবতাবাদের এবং মানুষের আধিপত্যের গুরুত্ব স্বীকার করেন। মানবিক সমস্যার প্রতিও তাদের একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, একতরফা প্রবণতাকে প্রত্যাখ্যান করে যা মানবতাকে দুর্বল করে এবং ব্যক্তির স্বাধীনতাকে শোষণ করে। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠাই একমাত্র লক্ষ্য। তাদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা মিল আছে বলে মনে হয় এবং বৈষম্যও দেখা যায়। এখানে তার দুটি মৌলিক নীতি, নব্য মানবতাবাদ এবং অস্তিত্ববাদ পদ্ধতির উপর মানবতাবাদী চিন্তাধারা আলোচনা করা হয়েছে, যা আধুনিক সমস্যার সাথে প্রাসঙ্গিক সমাধান উপস্থাপন করে। মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং জাঁ-পল সার্ত্র-র মিল এবং পার্থক্যের ভিত্তিতে তুলনা করা হবে, তাই তাদের উভয়ের তুলনামূলক আলোচনা করার আগে তাদের সামাজিক পটভূমি, সংস্কৃতি এবং জীবনধারা সম্পর্কে পারস্পরিক পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ তত্ত্বের উত্থান ও বিস্তারের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, অ-স্থিতিশীলতা এবং হতাশার পরিবেশ। দুই বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা অনেক দেশে সহিংসতা, শোষণ এবং তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা নিয়ে আসে। যুদ্ধে হাজার-লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছিল, প্রথম যুদ্ধের যন্ত্রণা থেকে মানুষ তখনও মুক্ত হতে পারেনি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানবজীবনের এমন নৃশংসভা, স্বার্থপরতা ও অত্যাচারের রূপ পেশ করে, যার ফলশ্রুতিতে মানুষ ঈশ্বর, ধর্ম, মূল্যবোধ ইত্যাদি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠতে থাকে। সারা বিশ্বে হতাশা, বেদনা ও অস্থিরতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মানুষের অস্তিত্বও সমস্যায় মধ্যে পড়েছিল, সেই সময় কার পরিস্থিতির দিকে তাকালে একটি নতুন পদ্ধতির উদ্ভব প্রয়োজন ছিল, যা মানুষকে তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করার আশা জাগাতে পারে। ফ্রান্স যখন জার্মানদের দখলে ছিল, সার্ত্র যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট ভয়, হতাশা এবং তিক্ততা অনুভব করেছিলেন, যা তার দর্শনেও প্রতিফলিত হয়। জার্মান কারাগারে বন্দী থাকাকালীনই তার দৃষ্টিভঙ্গির একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল। সেই সময়ে সাত্র তার রচনা ও নাটকের মাধ্যমে মানুষের অস্তিত্বের সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন। সিমোন দ্য বোভায়া বলেছেন যে, সার্ত্র এমন একটি দর্শন দেশকে দিয়েছিলেন যেটি সবেমাত্র একটি মহান যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছিল এবং বহু বছর ধরে ভুগছিল।

দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণকে তাদের পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করছিল। সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ শুধুমাত্র একটি দর্শন নয় বরং জীবনযাপনের একটি স্বতন্ত্র শৈলী ছিল। তিনি দর্শনের মাধ্যমে সাহিত্য, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র তথা সমাজের সকল দিককে প্রভাবিত করেছিলেন। সমাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি,

যা তৎকালীন বিশ্বযুদ্ধ দ্বারা প্রভাবিত মানব জীবন এবং সমাজের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল। এই কারণেই তিনি কেবল ফ্রান্সে নয়, সমগ্র ইউরোপে পরিচিত এবং সমাদৃত ছিলেন। মনে হয় সার্ত্রের আদর্শে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা জীবনের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে।

সার্ত্রের মতো মানবেন্দ্রনাথ রায়ও জেল জীবন ও যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তৎকালীন ভারতীয় সমাজ চরম সমস্যা ও প্রতিদ্বন্দ্বীতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। ভারত বহু বছর ধরে ব্রিটিশদের দাস ছিল। মানুষ ব্রিটিশদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিল। সমাজে ছিল সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাত, আঞ্চলিকতা, উঁচু-নীচুর পরিবেশ। যার কারণে জনগণের মধ্যে অশান্তি, অবিচার, দারিদ্র্য ইত্যাদি উৎপত্তি হয়েছিল। বহু বছর ধরে, ভারতীয় নাগরিকদেরকে বন্দীর জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছিল।বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ব্রিটিশদের প্রতি জনগণের মনে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষের জন্ম হয়েছিল, যার ফলে দেশে বিপ্লবীদের জন্ম হয়েছিল। তরুণরা রাজনৈতিক উদারপন্থীদের মতের সাথে একমত ছিল না। বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে চরমপন্থী সহিংসতার মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন এমন সময়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়ও তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন, তিনি বিশ্বাস করতেন যে ব্রিটেন সহিংসতার মাধ্যমে ভারতকে মুক্ত করবে। তখন বাংলায় স্বদেশী আন্দোলন চলছিল। একই সময়ে রায় রাজনৈতিক চেতনায় সচেতন হন। ছাত্রজীবনেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিপ্লবী। এতেই রায়ের জীবন স্পষ্ট।

শুরুটা ছিল স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে, তিনি সারা জীবনে স্বাধীনতা অর্জনে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।সম্ভবত এখান থেকেই তার মনে স্বাধীনতার বীজ বপন হয়েছিল। দেশকে স্বাধীন করা হোক আর ব্যক্তিস্বাধীনতা হোক, তিনি সর্বদা সংগ্রাম করে গেছেন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নব্য মানবতাবাদ প্রথাগত বিশ্বাস বা কুসংস্কার পরিত্যাগ করে এমন একটি দর্শন প্রতিষ্ঠা করে যা জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের স্বাধীনতা, মর্যাদা ও নৈতিক মূল্যবোধ নির্ধারণ করতে পারে। রায় ভারতীয় সমাজে একটি নতুন আদর্শের সূচনা করেছিলেন যা তাকে অন্যান্য দার্শনিকদের থেকে আলাদা করে তোলে। তিনি তাঁর দর্শনে মানুষকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। এটা স্পষ্ট যে প্রত্যেক চিন্তাবিদ অবশ্যই তার সময়ের পরিস্থিতি, জাতীয় ও সামাজিক চাহিদা দ্বারা প্রভাবিত। রায় এবং সার্ত্র উভয়ের দার্শনিক বিশ্বাসে জীবনের অভিজ্ঞতা স্পষ্ট বলে মনে হয়, অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবেই তাদের দর্শন তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অভিব্যক্তি, আদর্শিক পরিবেশ এবং সংগ্রামের ফল।

শৈশব থেকেই সার্ত্রের মনে ধর্ম ও ঈশ্বরের প্রতি অবহেলা ছিল। প্রথাগত মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের মধ্যে দিয়েই তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন। কিন্তু তার পিতামহ এবং মায়ের বুর্জোয়া মতামত সত্ত্বেও, এটি তার ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করেনি। সময়ের সাথে সাথে সে বুর্জোয়া সমাজ ও পরিবেশকে ঘৃণা করতে শুরু করে। মানবেন্দ্রনাথ রায় ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, মূর্তি পূজা, ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না। তার বাবা পুরোহিত পরিবারের ছিলেন, বাড়িতে ধর্মীয় চেতনার পরিবেশ ছিল। মানবেন্দ্রনাথ রায় ঈশ্বর ধর্মের ঐতিহ্যগত মূল্যবোধে বিশ্বাস রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা কখনই হতে পারেনি। ঈশ্বরের চেয়ে মানুষ ও তার বিবেকের প্রতি তাদের বিশ্বাস ছিল বেশি। দুই চিন্তাবিদই বিশ্বাস করতেন যে, ঈশ্বর, ধর্ম ও অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করে মানবজাতির বিকাশ সম্ভব নয়। এতে মানুষের স্বাধীনতা সীমিত হয়। খুব শুরুতে থেকে অধ্যয়ন, এই সমস্ত কুসংস্কার, ধারণা, গোঁড়া ধারণাগুলিতে বিশ্বাস ছিল না। এটা তার দর্শনেও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

জাঁ-পল সার্ত্র তার সৃষ্টি ও দার্শনিক মতাদর্শের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির জীবনে ঘটে যাওয়া দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্বের সূক্ষ্ম চিত্র তুলে ধরেন। এতে তিনি সম্পূর্ণ সফলও। মার্কসবাদের পর যে দর্শনটি তরুণ প্রজন্মকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে তা হল সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী দর্শন। 1940 এবং 1960 সালের মধ্যে ফ্রান্সে অস্তিত্ববাদের জন্য একটি শক্তিশালী উৎস ছিল। অস্তিত্ববাদের জনপ্রিয়তা এই সত্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, এটি মানুষের মধ্যে একটি নতুন ধর্ম হয়েছিল। লোকেরা অস্তিত্ববাদী চিত্রকলা, অস্তিত্ববাদী অর্থনীতি এবং এমনকি অস্তিত্ববাদী কফি হাউস সম্পর্কে কথা বলত। সার্ত্রের ধারণা আরও ছড়িয়ে পড়ে কারণ, তিনি একদিকে লেখাগুলো রেখেছিলেন এবং অন্যদিকে তাঁর দর্শনকে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছিলেন। তাঁর কাজগুলি জটিল দর্শন বুঝতে সাহায্য করেছিল। তাঁর চিন্তাভাবনাগুলি কাজগুলি জানার জন্য উপস্থিত ছিল। সার্ত্র বিশ্বাস করতেন যে একজনের জীবনকে অর্থ দেওয়ার জন্য অন্যজনকে কেবল নিজের উপর নির্ভর করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের কাজের জন্য দায়ী। মানুষ দায়িত্ববোধ নিয়ে স্বাধীনতার পথ বেছে নিয়ে সব ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ছিল একটি নতুন আশার আলো। তাই মাত্র তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বেশি বিখ্যাত এবং প্রিয় ছিলেন।

সার্ত্র বেশি জনপ্রিয় ছিলেন কিন্তু তিনি প্রচুর সমালোচিতও হন। কিছু কিছু মার্কসবাদী এবং ঐতিহ্যবাদী সমর্থকরা সার্ত্রের অস্তিত্ববাদের বিরোধিতা করছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সার্ত্রের ধারণা বিকৃত জীবনযাপন এবং অনৈতিকতার প্রচার করে। যা কোন ভাবেই মানুষ ও সমাজকে নৈতিকতার পাঠ দেয় না, কিন্তু এই সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন, সার্ত্রের দর্শনকে সঠিকভাবে না বোঝার কারণে, পরে সার্ত্র নিজেই এর সমাধান করেছেন। এটা স্পষ্ট যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খ্যাতি অর্জন করলেও তাকে কুখ্যাতি ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবন কর্মী এবং চিন্তাবিদ উভয় রূপেই ছিল। একজন জাতীয়তাবাদী হওয়ার পরে, তিনি বিচক্ষণতা এবং বুদ্ধিমত্তার দ্বারা কমিউনিস্ট জগতে একটি বিশেষ স্থান অর্জন করেছিলেন। তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার বাইরে মেক্সিকোতে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ভারতীয় সমাজেও কমিউনিজম সংগঠিত করার ক্ষেত্রে রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন। সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবী নেতা লেনিনের সাথে তার ভালো বন্ধুত্ব ছিল। পরবর্তীতে কিছু নীতির মতপার্থক্যের কারণে তাকে কমিউনিস্ট সংগঠন ত্যাগ করতে হয়, তবে জাতীয় পর্যায়েও তার বিশেষ অবদান ছিল। ভারতে ফিরে আসার পর তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। দেশকে স্বাধীন করার ইচ্ছা তার প্রথম থেকেই ছিল। শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক জীবন ত্যাগ করে তিনি নব্য মানবতাবাদের নীতি প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র মানব জাতির উন্নয়নে অবদান রাখেন। তিনি শোষণমুক্ত সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও নৈতিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন।

সারাজীবন মানুষ ও সমাজের কল্যাণে সম্পূর্ণ নিবেদিত থাকার পরও রায় ভার প্রাপ্য প্রত্যাশিত সাফল্য পাননি। এটা পরিহাসের বিষয় হবে যে মানবেন্দ্রনাথ রায়, যিনি আন্তর্জাতিক স্তরে কমিউনিস্ট ইউনিয়নে তাঁর বিস্ময়কর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁকে নিজ দেশে উপেক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, যদি একজন ব্যক্তি তিনি যদি তৎকালীন রক্ষণশীল মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যগত

বিশ্বাস ভাঙার চেষ্টা করেন, তাহলে এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই বিড়ম্বনা সর্বদা কুসংস্কার এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসের জায়গায় যুক্তিবাদী জ্ঞানের ভিত্তিতে বিকাশের সাথে জড়িত। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে তার দীর্ঘদিন বিদেশে থাকা। তিনি তার জীবনধারা, পোশাক, ভাষা এবং সংস্কৃতিতে বহিরাগত দেখাচ্ছিলেন, যার কারণে ভারতের মানুষ তার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেনি।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সমগ্র জীবন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিল। তিনি ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে, পুঁজিবাদের বিরোধিতা এবং সাম্যবাদের ব্যর্থতার কারণে, তিনি এমন একটি দর্শনের প্রয়োজন অনুভব করেন যা সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের সাথে জড়িত, যেখানে রাষ্ট্র বা জাতি কেউই থাকবে না, কারণ এতে একটি সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ, ফ্যাসিবাদের পরিবেশ। একমাত্র নব্য মানবতাই পারে বিশ্ব দর্শনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে। বিপরীতে, সার্ত্রে তার জীবনের শেষ পর্যায়ে রাজনৈতিক। কর্মকাণ্ডে আগ্রহী হতে শুরু করেন। ভিয়েতনামে আমেরিকান বোমা হামলায় হাজার হাজার মানুষ নিহত হওয়ার সময় তিনি প্রায়শই রাজনৈতিক সম্মেলনে যেতেন, সমাবেশ ও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতেন। এমন সময়ে সার্ত্র বিশ্বাস করতেন যে "লেখার কোনো উপযোগিতা অবশিষ্ট নেই। সমাজকে বাঁচাতে শুধু সাহিত্যের কথায় কাজ হবে না। এখনই সময় কর্মের মাধ্যমে পরিবর্তন করা। কথার কোনো অর্থ নেই। শুধু কর্মের মাধ্যমেই বিশ্ব ও সমাজ চলতে পারে।"

মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং জা পল সার্ত্র উভয়েই বিশ্বাস করেন যে মানব জীবনের জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য। স্বাধীনতার বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলনীয়। সার্ত্র স্বীকার করেছেন যে, মানুষের স্বাধীনতা যার দ্বারা মানুষ বিনা বাধায় তার নির্যাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এটি মানুষের অস্তিত্ব থেকে পৃথক নয়। এমন নয় যে মানুষ প্রথমে অস্তিত্বে আসে এবং পরে ধীরে ধীরে স্বাধীনতা অনুভব করে, তবে ব্যক্তির অস্তিত্ব এবং তার স্বাধীনতার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। অস্তিত্বের প্রথম অভিজ্ঞতাতেই মানুষ মুক্ত আত্মা সম্পর্কে সচেতন হয়। স্বাধীনতা ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

সার্ত্রের দর্শনে স্বাধীনতা মানে সিদ্ধান্ত বা পছন্দের স্বাধীনতা। একজন ব্যক্তি সর্বদা যে কোনও পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা অনুভব করে। সেই পরিস্থিতিতে তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি একজন ব্যক্তি তার স্বাধীন সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে সে অপমানে ভুগতে হয়। এটা সর্বজনীনভাবে বলা হয় যে, স্বাধীনতা মানুষের জন্য একটি অভিশাপ। মানুষকে এমন একটি পছন্দ করতে হবে যা তার অভিশাপ দেখায়। মানুষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একা। এটা স্পষ্ট যে, মানুষ তার নিজের ভাগ্য তৈরি করতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। মানবতাবাদ অনুসারেও মানুষ তার নিজের ভাগ্যের স্রষ্টা। লক্ষ্যগুলি যার জন্য একজন ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্জন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তার সিদ্ধান্তের জন্য তিনি নিজেই দায়ী। স্বাধীনতার ফলাফল দায়িত্বের মধ্যেই নিহিত। এটি সার্ত্রের স্বাধীনতার ধারণার বিশেষত্ব যা তাকে দায়ীদের সাথে সংযুক্ত করে। স্বাধীনতা মানে এই নয় যে একজন মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে বা যা খুশি পেতে পারে। মানুষের স্বাধীনতাকে কাজে লাগানোর সময় দায়িত্ববোধের কথা মাথায় রেখে আচরণ করা উচিত। মানুষ শুধুমাত্র নিজের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য বেছে নেয়। সার্ত্রের কাছে স্বাধীনতার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। এটা শুধু তত্ত্বের পর্যায়েই নয়, তার জীবনেও তা দেখা যায়। যখন আলজেরিয়া ছিল ফ্রান্সের উপনিবেশ। সার্ত্র আলজেরিয়াকে ফরাসিদের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার পক্ষে ছিলেন, আলজেরিয়ার জনগণের প্রতি তার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। যার কারণে তাকে তার দেশ ফ্রান্সে দেশ বিরোধী হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি

বিশ্বাস করতেন যে, স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের জন্মগত অধিকার। মুক্ত হওয়াটাই মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং তার অনুভূতির জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। স্বাধীন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার ক্ষমতা বিকাশ করতে পারে। নিজের জীবনের ঝামেলা এবং সমস্যাগুলি অনেকাংশে শেষ করতে পারে।

স্বাধীনতা সংক্রান্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতামতকে যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে তাঁর মতে স্বাধীনতা মানে মানুষের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার প্রগতিশীল বিকাশ। তিনি নব্য মানবতাবাদে তিনটি মৌলিক মূল্য বিবেচনা করেছেন। যথা- ১.স্বাধীনতা, ২. বুদ্ধিমত্তা এবং ৩. নৈতিকতা। স্বাধীনতা সকল মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তি ও উৎস। এখানে রায় স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ নৈতিক মূল্য বলে মনে করেন। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিত্বের সহজাত প্রবণতা। রায় বলেন, স্বাধীনতার সন্ধান এবং সত্যের সন্ধানই মানুষের অগ্রগতির মূল আকাঙ্খা। স্বাধীনতার অনুসন্ধান হল বুদ্ধিমত্তা এবং আবেগের উচ্চ স্তরে অস্তিত্বের জন্য একটি জৈব সংগ্রামের ফলাফল। স্বাধীনতা অর্জন মানুষের স্বাভাবিক গুণ, এটি জৈবিকভাবে মানুষের অন্তনিহিত। স্বাধীনতা মানুষের সামগ্রিকতার সাথে সম্পর্কিত। স্বাধীনতার অনুভূতি একজন ব্যক্তির সমগ্র রূপের অন্তর্নিহিত, স্বাধীনতার অর্থ কেবল বাহ্যিক বন্ধন থেকে মুক্তি নয়, স্বাধীনতা বলতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ক্ষমতার সর্বাত্মক বিকাশকে বোঝায়। একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্ত নয় যতক্ষণ না সে তার মধ্যে থাকা সম্ভাবনাগুলি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সেগুলি বিকাশের আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় সব ক্ষেত্রে মানুষকে স্বাধীনতা প্রদান করা যে কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব, যাতে একজন ব্যক্তি তার যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার ভিত্তিতে ইতিবাচক হতে পারে। বিকাশ করতে পারে এর আগে একজন মানুষকে মানসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্ত হতে হবে, তাকে সমস্ত কুসংস্কার, ও কুপ্রথা থেকে মুক্ত হতে হবে। মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্ব এই মূল্যের উপর ভিত্তি করে। রায় মনে করেন, সব মানুষের সর্বোচ্চ স্বাধীনতা পাওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। মানুষকে সুযোগ প্রদান প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতার আদর্শকে পূর্ণ করবে, যাতে ব্যক্তি নিজেকে এবং সমাজের বিকাশ করতে সক্ষম হবে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এটা স্পষ্ট যে, রায় এবং সার্ত্র উভয়েই মানব অস্তিত্বের জন্য স্বাধীনতাকে অপরিহার্য বলে মনে করেন। সার্ত্রের মতে, স্বাধীনতা কোনো গুণ বা মূল্য নয়। মানুষ জন্মগতভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন কিন্তু রায় এটাকে মানুষের সর্বোচ্চ মূল্য হিসেবে গ্রহণ করেন। এটাই মানুষের শেষ, যার জন্য মানুষ সবসময় চেষ্টা করে। সার্ত্রের দর্শনে, স্বাধীনতা কেবল ব্যবহারিক স্তরে স্বাধীন সিদ্ধান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সার্ত্রের মত, রায়ের দর্শনেও স্বাধীনতার অভিজ্ঞতামূলক জীবনে সীমাবদ্ধতার অভাব রয়েছে। উভয় চিন্তাবিদদের মতে, স্বাধীনতা মানব ব্যক্তিত্ব গঠনের একটি পূর্বশর্ত ধারণা। মানুষ মুক্ত হয়েই নিজেকে তৈরি করতে পারে।

মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং জা পল সার্ত্র উভয় দার্শনিক মানব স্বাধীনতার দৃঢ় সমর্থক হওয়ার কারণে মানুষ কোনো ধরনের অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস করেন না যে তিনি যেমন আছেন এবং নিজেকে যেমন তৈরি করতে চান। তিনি একইভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। তারা মানুষের অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন অনুভব করেনি। মানবেন্দ্রনাথ রায় ঈশ্বরের মতো অতিপ্রাকৃত শক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি সব ধরনের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন, তিনি যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সমর্থন করেছিলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বে অসংগত ও অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস হয়। রায় সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদী দার্শনিক। বস্তুবাদ তত্ত্ব অনুসারে, ভৌতই একমাত্র চূড়ান্ত বাস্তবতা, কোন ঈশ্বর বা রহস্যময় সত্ত্বা এই পৃথিবী সৃষ্টি করে না। প্রকৃতি তার পূর্ব

নির্ধারিত নিয়মে চলে। ঈশ্বর এই নিয়মের পরিচালক নন। মানুষও ঈশ্বরের মতো অলৌকিক শক্তি থেকে উদ্ভূত হয়নি। তিনি তার বুদ্ধিমত্তা, আবেগ, ইচ্ছা, এবং মন দিয়ে একত্রিত প্রকৃতির একটি অংশ। আমরা যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, তাহলে আমাদের নির্ণয়বাদে বিশ্বাস করতে হবে যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এর ফলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি শেষ হয়ে যায়, রায় সত্যিকারের মানবতাবাদী হয়েও এটা মেনে নেননি, তিনি বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর সবসময় মানুষের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন। যেমন তিনি তার বই 'বিয়ন্ড কমিউনিজম'-এ বলেছেন মানুষ কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে? কারণ তারা নিজেদেরকে অক্ষম ও অসহায় মনে করে। তাদের এমন কিছু সমর্থন বা স্বীকারের প্রয়োজন যার কারণে মানুষ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখে। মানুষ মনে করে যে, একমাত্র ঈশ্বরই তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারেন। তাই রায় বলেছেন যে, ভারতীয় জনগণের দাসত্বের সবচেয়ে বড় কারণ হল ঈশ্বর এবং ভাগ্যের প্রতি অত্যাধিক বিশ্বাস। তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন যে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক আন্দোলন জনগণকে অনুপ্রাণিত করবে যে, মানুষ তার নিজের ভাগ্যের নির্মাতা, সে অক্ষম নয়। এই দুঃখের জগৎ মূলত তাদেরই সৃষ্টি, এটা তাদের নিজেদের নিষ্ক্রিয়তার ফল। মানুষ একটি উন্নত পৃথিবী তৈরি করতে সক্ষম। তার মানে মানুষকে নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে যে অন্য কেউ তার দুঃখ শেষ করতে পারবে না।

রায়ের মতো সার্ত্রে ও বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর চেতনার উপলব্ধি প্রথম জিনিস নয়, কোনও চিন্তা জন্মের সাথে শুরু হয় না। প্রথমত, একজন ব্যক্তির তার অস্তিত্বের চেতনা রয়েছে, অস্তিত্বের উপলব্ধিতে, একজন ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা লাভ করে। তবেই চিন্তাশক্তির জন্ম হয়। সমস্ত আদর্শগত বিকাশের সাথে ঈশ্বরের অনুভূতিও জড়িত। এটি মানুষের প্রাথমিক চেতনা অনুসারে তৈরি করা একটি কাঠামো। মানুষ কীভাবে ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় গঠন করে সে সম্পর্কে সর্বদা অনেক যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। ঈশ্বরের ধারণা একটি কল্পনা মাত্র। একজন কল্পনা করে যে অন্য একজন আমার দিকে তাকিয়ে আছে এবং আমি যেভাবে অন্যের দিকে তাকাচ্ছি। একইভাবে কিছু পরম সত্তা আমার এবং অন্যদের দ্রষ্টা হবেন। সার্ত্রের মতে, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করা যায় না, ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নিলেও তা মানুষের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সর্বদা বাধা হয়ে থাকবে। ঈশ্বর মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা সীমিত, ঈশ্বর এবং মানুষের স্বাধীনতার মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। যদি ঈশ্বর মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেন, তাহলে ঈশ্বর অবশ্যই মানুষকে একটি পূর্বকল্পিত ধারণা অনুসারে সৃষ্টি করেছেন, যেমন একজন কারিগর তার শিল্পকর্ম তৈরি করে। এভাবে আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে যাবে ব্যক্তির স্বভাব। এর ফলে মানুষের স্বাধীন সিদ্ধান্ত লোপ পাবে। একজন ব্যক্তিকে মুক্ত বলা যাবে না কারণ তার রূপ আগেই নির্ধারিত। সার্ত্রে কখনই মেনে নেয় না যে মানুষ মুক্ত নয়। তার মতে মানুষের কোনো পূর্বনির্ধারিত প্রকৃতি নেই। মানুষের ভাগ্য ঈশ্বর দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত হতে পারে না। মানুষের ভবিষ্যত ঈশ্বর দ্বারা নির্ধারিত হয় না, মানুষ নিজেই সারমর্ম অস্তিত্বের পরে আসে যার কারণে তারা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেছে। তারা স্পষ্টভাবে বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকলেও তাতে কিছু আসে যায় না। এটি মানুষের অস্তিত্বের আসল সমস্যা নয় যাতে সমস্ত শক্তি প্রযোগ করা উচিত, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য নয়।

এটা স্পষ্ট যে উভয় দার্শনিকই মানুষকে ঈশ্বরের পুতুল মনে করেন না এবং তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করেন, ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের ধারণা অনেকাংশে একই রকম। তিনি পূর্বনির্ধারণ বা নিয়তিবাদে বিশ্বাস করেন না। রায়ের নব্য মানবতাবাদ এবং সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ উভয়ই নাস্তিক। উভয় চিন্তাবিদদের লক্ষ্য সমগ্র মানবতার কল্যাণ। মানুষের অস্তিত্ব এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করা। মানবতাবাদও

ঈশ্বরের মতো অলৌকিক শক্তিকে তার আসল আকারে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের মতামতের সাথে পুরোপুরি একমত হতে পারি না। তার মতে, ঈশ্বর একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা সীমিত করেন। কিন্তু ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ বাধা হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। মানুষ স্বাধীন হয়েও ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে পারে। এটি ব্যক্তির স্বাধীনতার উপরও নির্ভর করে।

মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং জা-পল সার্ত্র উভয়ের দর্শনেই ধর্ম সম্পর্কিত ধারণা একই রকম। তিনি ধর্মের নামে আচার-অনুষ্ঠান, কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরোধিতা করেছেন। প্রকৃত ধর্মই হতে পারে সেই ধর্ম যা সমাজ ও মানুষের মধ্যে ঐক্য, শান্তি ও প্রগতি বাড়ায়। বর্তমান পরিস্থিতিতে বৈজ্ঞানিক নীতির উপর ভিত্তি করে এমন একটি ধর্মের প্রয়োজন রয়েছে। ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে উভয় চিন্তাবিদ নৈতিকতাকে মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করেছেন, তারা স্পষ্টভাবে বিশ্বাস করেন যে নৈতিকতা ধর্মীয় হতে পারে না। ধর্ম মানুষের উন্নতির অন্তরায়। মানবেন্দ্রনাথ রায় ধর্মকে অসন্তোষজনক ও অবৈজ্ঞানিক বলে মনে করেছেন। ধর্মে আবেগ দিকের প্রাধান্যের কারণে যুক্তির অভাব দেখা যায়, যার কারণে মানুষ তার বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকৃতি ভুলে গেছে। বেশিরভাগ ধর্মই রক্ষণশীলতা, কুসংস্কার, ঐতিহ্যগত শাসন, এবং নিয়তিবাদের সাথে সম্পর্কিত, তাই তিনি ধর্মকে নৈতিকতার সাথে যুক্ত করার পক্ষে মোটেও ছিলেন না। রায় কার্ল মার্ক্সের ধর্মের সাথে সম্পূর্ণ একমত। মানুষের জন্য আদিম ধর্ম সবসময় মানুষের স্বাধীনতার অন্তরায়। তিনি মানবতাবাদী মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে একটি নৈতিক দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যেখানে বৈষম্যের স্থান নেই, এটি সম্ভব হয়েছে কারণ রায় বিশ্বাস করেন যে মানুষ একটি যুক্তিবাদী সত্তা। একজন ব্যক্তির নৈতিক হওয়া তার আধ্যাত্মিক কারণ নয়। এটি সম্পূর্ণরূপে মানুষের বিচক্ষণতার উপর নির্ভর করে। এটি দেবী বিশ্বাস বা সামাজিক নিয়ম বা অন্য কোন বাহ্যিক ভয়ের উপর ভিত্তি করে নয়। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের নৈতিক আচরণ তার নিজের বিবেকের ক্ষমতা থেকে উদ্ভূত হয়। ঈশ্বরের ভয়, ধর্মের চাপ এবং সামাজিক নিয়মের শক্তি দ্বারা নৈতিকতা বিকাশ করা যায় না। শুধুমাত্র একজন মুক্ত ও যুক্তিবাদী ব্যক্তিই নৈতিক আচরণ গ্রহণ করতে পারে।তিনি ধর্মকে নৈতিকতা থেকে আলাদা রাখতে চেয়েছিলেন, নৈতিকতা মানুষের জন্য অপরিহার্য, ধর্মকে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করতেন, সত্যিকারের মানবতাবাদী হয়েও রায় যে মানব সমাজে বা রাষ্ট্রে ধর্মকে কোনো গুরুত্ব দেন না তা নিশ্চিত ছিলেন। তার জন্য একজন আধ্যাত্মিক মানুষ কখনই মুক্ত হতে পারে না।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতো সার্ত্র ধর্মকে মানুষ ও সমাজের উন্নয়নে সহায়ক বলে মনে করেন না। সার্ত্র বলেছেন যে, একজন ব্যক্তির ধর্মীয় জীবন তার অসাম্প্রদায়িকতার ফল। তার স্বাধীনতা ও দায়িত্বের বোঝা এড়াতে মানুষ ধর্ম ও ঈশ্বরের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়। একজন মানুষের জন্য ধার্মিক হওয়া মানে তার বাস্তবতা থেকে পালানো। যারা ধর্মের বিধি-বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়। এসব মানুষ দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে। এই ধরনের লোকদের তাদের খাঁটি প্রকৃতির জ্ঞান নেই, তারা অনস এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। মাত্র ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দিয়েছেন।

সার্ত্র অস্তিত্ববাদী দর্শন এই ধরনের কোনো অগ্রাধিকার নীতি বা পূর্ব-স্বীকৃত মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে নয়। তিনি নৈতিক মূল্যবোধ গ্রহণ করেছেন কিন্তু চিরন্তন মূল্যবোধকে উপেক্ষা করেছেন। তার মতে, মূল্যবোধের স্রষ্টা মানুষ, মূল্যবোধের বৈধতা নির্ভর করে ব্যক্তির পছন্দের ওপর, কোনো মূল্যই নিজের মধ্যে ভালো বা খারাপ নয়। যখন একজন ব্যক্তি নির্বাচিত হন, তখন তার শুভ বা অশুভ সম্পর্কে জ্ঞান থাকে,

মূল্যবোধের নিজের মধ্যে কোন অর্থ থাকে না। মানুষই মূল্যবোধকে অর্থ দেয়। এটা তার মতামত থেকে স্পষ্ট যে মান ইতিমধ্যে তৈরি করা হয় না। যাদের শুধু অনুসরণ করতে হবে। নির্বাচনের আগে মূল্যবোধের কোনো অস্তিত্ব নেই। পৃথিবীতে এমন কোনো সর্বজনস্বীকৃত নৈতিক নিয়ম নেই যা বলতে পারে তার পছন্দ সঠিক না ভুল। এটি একজন ব্যক্তির স্বাধীন সিদ্ধান্তের ফললাফল।

যদি সার্ত্রের ধারণা যে মানুষই মূল্যবোধের প্রবর্তক, তাহলে একজন ব্যক্তির দ্বারা নির্বাচিত মান হবে অন্যের জন্য তৈরি করা মান। এটা সকলের জন্য উপযুক্ত, কোনো সাধারণ নৈতিক নিয়ম ছাড়া, ব্যক্তির দ্বারা মূল্যবোধের বৈধতা সময় নয়। মূল্যবোধ তখনই মূল্যায়ন করা যায় যখন একজন ব্যক্তির পূর্বে জ্ঞান থাকে যে তার জন্য কোনটি সঠিক বা খারাপ, এটি এমন নয় যে তার দর্শনকে অনৈতিক বলা যেতে পারে, তিনি স্পষ্টভাবে বিশ্বাস করেন যে মানুষের যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, তবে তাদের এটি করা উচিত নয়। যেকোনো ধরনের চাপ.. একজন ব্যক্তির নিজের এবং অন্যান্য মানুষের কথা মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। তিনি বলেন, নৈতিকতা অনুযায়ী সংসার চালাতে হলে কিছু মূল্যবোধকে বেশি গুরুত্ব দিতে হয়। মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন সৎ হওয়া, মিথ্যা কথা না বলা, সন্তানদের লালনপালন করা ইত্যাদি। তারা সমাজের মসৃণ কার্যকারিতার জন্য কিছু মূল্যবোধের গুরুত্ব স্বীকার করেছে।

মানবেন্দ্রনাথ রায় বর্তমান সভ্যতাকে নৈতিক সংকট বলেছেন। তার মতে পৃথিবী মূলত একটি নৈতিক জগত। কিন্তু ভার নৈতিকতার উৎস কিছু অতীন্দ্রিয় শক্তি নয়। নৈতিক নিয়ম জগৎ-র মধ্যেই অন্তর্নিহিত। মানুষ জৈবিক বিবর্তনের ফল। সুতরাং, একটি জৈবিক সত্তা হওয়ায় নৈতিক ও যুক্তিবাদী হওয়া মানুষের স্বভাব। মানুষের নৈতিকতা তার সহজাত যৌক্তিকতার ফলাফল,তাই নৈতিক হতে হলে কেবল মানুষ হওয়া প্রয়োজন, কোন ঐশ্বরিক বা আধ্যাত্মিক শক্তির সন্ধান করা অপ্রয়োজনীয়। কোনো বাহ্যিক ভিত্তিতে নৈতিকতার উৎস খোঁজা মানুষকে নৈতিকতা থেকে বঞ্চিত করা। একজন ব্যক্তির নৈতিক আচরণ কোন বাহ্যিক চাপ বা ভয় দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারে না। এর জন্য একজন ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা থাকতে হবে। যদি একজন ব্যক্তি স্বাধীন না হয় তবে সে নৈতিক ও অনৈতিক বিকল্প বেছে নিতে অক্ষম। ইচ্ছার স্বাধীনতার অভাবে তাকে দায়ী বলা যায়। না।

রায় স্বাধীনতাকে জীবনের সর্বোচ্চ মূল্য বলেছেন কারণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই মানুষের অস্তিত্বের সারাংশ। নৈতিক মূল্যবোধ মানুষের জৈবিক ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত। নৈতিক মূল্যের গ্রহণযোগ্যতার জন্য মানুষের অস্তিত্বের বাইরে কিছুর প্রয়োজন হয় না। সবাই স্বাধীনতা চায়। মানুষের সহজাত প্রবণতা হল স্বাধীনতার সন্ধান করা, এই প্রবণতাটি ব্যক্তির ধীরে ধীরে বিকাশের মাধ্যমে অর্জিত হয়। রায় সত্য এবং জ্ঞানকে অন্তর্নিহিত মূল্য হিসাবে বিবেচনা করেন। এটা স্পষ্ট যে যুক্তিবাদী মানুষ ছাড়া একটি সমাজ নৈতিক হতে পারে না কারণ সমাজ নির্ভর করে ব্যক্তির নৈতিকতার ওপর। এখানে রায় মানুষের গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

নৈতিক মূল্যবোধের উদ্ভব হল একটি জৈবিক বিবর্তনীয় প্রক্রিয়া এবং যৌক্তিক উদ্দেশ্য যা মানুষের সহযোগিতামূলক সামাজিক অস্তিত্বের জন্য উপকারী। প্রেম, দয়া, সত্য, ভ্রাতৃত্বের মতো নৈতিক মূল্যবোধ মানব সমাজের জন্য স্থায়ীভাবে সহায়ক বলে বিবেচিত হয়। রায় একজন মানবতাবাদী, তাই তার মতে মানুষই সবকিছুর মাপকাঠি। মাপকাঠি মানুষের থাকে, সমাজের নয়। একবার মূল্যবোধ তৈরি হয়, সমাজে গৃহীত হয়। রায়ের জন্য, নৈতিক মূল্য পরম; মান, মানবসৃষ্ট হওয়া, তিনি স্রষ্টার উপর নির্ভর করে না। এই

ব্যক্তি আপেক্ষিক নয়। মূল্যবোধের উদ্ভবের পর বহু বছর ধরে সমাজে বসবাস করেন। এর জন্য প্রযোজকের প্রয়োজন নেই। রায় আপেক্ষিক নীতিশাস্ত্র গ্রহণ করেন না।

মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং জা পল সার্ত্র উভয়েই বিশ্বাস করেন যে, পৃথিবীতে মানুষের সর্বাগ্রে স্থান রয়েছে, সমস্ত জিনিস এবং ধারণা পরম নয়, সেগুলি সবই মানুষের উপর ভিত্তি করে। সমগ্র মানবতার কল্যাণই তাঁর দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য। এটি মানুষকে শুধুমাত্র একজন মানুষ হিসাবে দেখে এবং শাশ্বত আত্মা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অংশ হিসাবে নয়। মানুষ নিজের এবং সমাজের সামগ্রিক বিকাশের জন্য দায়ী। এতে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সব ধরনের উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একজন ব্যক্তির কাজ শুধুমাত্র তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, এটি অন্যান্য মানুষ এবং সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে। উভয় দার্শনিকের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য ধারণা দেখার পর, এখন আমরা কিছু বৈষম্যের ধারণাগুলি জানার চেষ্টা করব।

রায়ের দর্শনে মানব প্রকৃতির বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি মানুষের স্বরূপ জানার চেষ্টা করেছে যে, মানুষের সারমর্ম কী? এবং এর সাথে তিনি মানবিক গুণাবলীও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি তার নীতিতে বলেছেন যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে যুক্তিবাদী, একটি নিয়ন্ত্রিত বস্তুগত প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত। প্রকৃতিতে কারণ এবং প্রভাবের নিয়ম রয়েছে, অর্থাৎ এটি স্পষ্ট যে প্রকৃতির এই নিয়মটি মানুষের জন্যও প্রযোজ্য, যাতে একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভিত্তিতে মানব প্রকৃতি এবং আচরণ অধ্যয়ন করা যায়। অন্য দৃশ্যমান বস্তুর অধ্যয়নের মতোই একজন ব্যক্তির বৈষম্যমূলক গুণ প্রকৃতির অংশ হওয়ার উপর নির্ভর করে। যুক্তিবাদী হওয়া একজন ব্যক্তির গুণ এবং একজন ব্যক্তির মেধা প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত হয়।

রায় মানব প্রকৃতি সম্পর্কে দুটি ভ্রান্ত ধারণাও খণ্ডন করেছেন। প্রথমত, ব্যক্তি স্বভাবগতভাবে স্বার্থপর এবং দ্বিতীয়টি, কিছু অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাস করেন যে, উপরের দুটি ভ্রান্ত ধারণাই মানুষকে দুর্বল করে তোলে। অর্থাৎ মানুষ প্রকৃতিগতভাবে পাপী, যার জন্য কোনো না কোনো দেবতা বা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়। মানুষ জগৎ-র একটি অংশ, যার রূপটিও প্রকৃতিবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মানবজাতির বিকাশের নিয়মগুলি বিবর্তনের সাধারণ নিয়ম থেকে আলাদা। পৃথিবী নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, মানুষের ইচ্ছা শক্তি আছে, পছন্দের স্বাধীনতা আছে। স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা মানুষের স্বভাব। সভ্য আবিষ্কার করতে হবে। রায় মানুষের যুক্তিবাদী গুণকে নৈতিকতার উৎস হিসেবে বিবেচনা করেছেন। মানুষ যুক্তিবাদী এটা নৈতিকও বটে। একজন ব্যক্তির নৈতিক হওয়া যে কোন ধর্ম, বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে।

রায়ের বিপরীতে, জা-পল সার্ত্র মানব প্রকৃতির ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি স্পষ্টভাবে বিশ্বাস করেন যে, মানব প্রকৃতির ব্যাখ্যা করা অসম্ভব যা প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে সার্বজনীন সারাংশ বলে বলা হয়। তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শন কোনো পূর্ব-নির্ধারিত সারাংশে বিশ্বাস করে না। মানুষের অস্তিত্ব প্রথম। পরে তিনি তার সারাংশ সংজ্ঞায়িত করেন। ব্যক্তির সামনে কোন সৃষ্টি হয় না। যেহেতু এমন কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই যার মনে আগে থেকেই মানুষের ধারণা আছে, তাই এমন কোন জিনিস নেই যাকে মানব প্রকৃতি বলা যেতে পারে। মানুষের স্বভাবের মতো এমন কিছু নেই যা থেকে অনুমান করা যায় যে সে এমন আচরণ করবে। যখন একজন ব্যক্তি তার পছন্দ এবং সৃষ্টি অনুসারে নিজেকে তৈরি করে।

সার্ত্রে স্বাভাবিক মানব প্রকৃতি প্রত্যাখ্যান করার সময় মানুষের অবস্থা গ্রহণ করে। অবশ্যই কিছু সাধারণ পরিস্থিতি রয়েছে যেখান থেকে ব্যক্তিটিকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে একটি মানুষের সার্বজনীনতা আছে, কিন্তু এটা আগে থেকে চিহ্নিত করা হয় না। মানব প্রকৃতি সম্পর্কে রায় এবং সার্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে স্পষ্টতই একটি বৈষম্য রয়েছে।

কার্ল মার্কসের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা মানুষের চিন্তাধারাকে এক নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছে। মার্কসবাদের প্রভাব এতই সর্বব্যাপী যে বর্তমানে লক্ষ লক্ষ মানুষ তার ধারণাগুলিকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, মার্কসবাদী আদর্শ বিংশের ভারতীয় সমাজকে প্রভাবিত বিংশ শতাব্দীর পশ্চিমা চিন্তাবিদদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং জা-পল সার্ত্র উভয়েই জীবনেই মার্ক্সের প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। তাদের দর্শনে যে, যুক্তি ও অধিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে, বস্তুবাদ চেতনার চেয়ে বস্তুকে অগ্রাধিকার দেয় এবং ইতিহাসে ব্যক্তির নির্ণয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে। এটি মানব বাস্তবতার উপর বস্তুগত প্রকৃতির নিয়মকে চাপিয়ে দেয়। বস্তুবাদ একটি সমানভাবে গোঁড়া দার্শনিক মতবাদে পরিণত হয়।

সার্ত্র মার্কসবাদের কিছু বিষয়ের সমালোচক ছিলেন কিন্তু তিনি কখনই সর্বহারা বিপ্লবের বিরোধী ছিলেন না। বিরোধিতা থাকলে সেই বিপ্লবকে বস্তুবাদী ন্যায্যতা দিয়ে তিনি বিশ্বাস করতেন যে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বস্তুবাদ একটি মিথ হতে পারে, কিন্তু বিপ্লবের জন্য সত্যের প্রয়োজন, মিথ নয়। সার্ত্র এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন না যে মানুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত এবং প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কাজ করে। তিনি শুধু বলতে চেয়েছেন যে মানব জগতের বাস্তবতা বস্তুজগতের বাস্তবতা থেকে ভিন্ন। সার্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে মানুষ তার সীমার মধ্যেই প্রকৃতির জ্ঞান লাভ করতে পারে, একজন মানুষ নিজেকে যতটা ভালোভাবে জানতে পারে, সে প্রকৃতিকে জানতে পারে না। বস্তুবাদের সমালোচনা করে, সর্বদা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মার্কসবাদের সমগ্র কাঠামোতে বস্তুবাদের উদ্দেশ্য অধিবিদ্যা বা তত্ব নয়, শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক নির্দেশনা। সার্ত্র মার্কসবাদকে পুরোপুরি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি কারণ সার্ত্র তরুণ মার্কসের মানবতাবাদী ধারণার দ্বারা বেশি প্রভাবিত ছিলেন, যিনি মানব বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছিলেন। যিনি ব্যক্তির যোগ্যতা ও সামর্থ্যে বিশ্বাসী ছিলেন এবং নিজের ইতিহাস তৈরির দাবি করেন। মার্কসের প্রতি সার্ত্রের অনুরাগ মাঝে মাঝে জেগে উঠতে থাকে। তিনি চেয়েছিলেন মার্কসবাদ যেন কয়েকটি দিকে সীমাবদ্ধ না থাকে। তিনি মার্ক্সের মানবপ্রকৃতি পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন।

সার্ত্রের মতো, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জীবনেও মার্ক্সবাদী চিন্তাধারা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। প্রথমদিকে, রায় মার্কসের নীতি দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন। তিনি একজন সম্পূর্ণ মার্কসবাদী ছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, তিনি বস্তুবাদের নীতিকেই প্রকৃত দর্শন হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে বস্তুবাদের সাথে মিশিয়ে দেওয়া মার্কসবাদের সবচেয়ে বড় ভুল। এটি বস্তুবাদ তত্বকে গুরুত্বহীন করে তোলে, যুক্তিবিদ্যা ও সত্তাতান্ত্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মার্কসের বস্তুবাদ তত্বে স্বাধীনতা ও নৈতিক মূল্যবোধকে উপেক্ষা করা হয়, যেখানে মানুষের শারীরিক কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা রয়েছে, কিন্তু এর কোনো আবেগগত দিক নেই। ব্যক্তিগত জায়গা নেই। তিনি বস্তুবাদের দর্শনের উপর জোর দেন, যা নিজেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তির উপর ভিত্তি করে, যা প্রকৃতির রহস্য জানতে চায়,

জীবন ও জগতের বাস্তবতাকে গ্রহণ করে, অধিবিদ্যা এবং ধর্মের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং একটি নতুন মানব গড়ে তোলে। সমাজ তৈরি করে। এটাই একমাত্র দর্শন যা মানুষকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক কল্যাণ প্রদান করতে পারে। এটি আধ্যাত্মিক মুক্তির সঠিক পথ।

সার্ত্র এবং রায়ের মধ্যে পার্থক্য বস্তুবাদ সম্পর্কিত ধারণাগুলিতে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সার্ত্র যেখানে বস্তুবাদ তত্বকে মানুষের কল্যাণে উপযোগী বলে মনে করেন না, অন্যদিকে রায় বস্তুবাদ দর্শনকে বিপ্লবের দর্শন বলে মনে করেন যা বিশ্বাসের পরিবর্তে জ্ঞান ও প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়। চিন্তায় সাম্য ও বৈষম্য সত্ত্বেও মানুষকে তার দর্শনে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। রায়ের নব্য মানবতাবাদের অনুরূপ অস্তিত্ববাদও বহুস্ব, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পক্ষে। ব্যক্তির পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই সমাজ এগিয়ে যেতে পারে। যে কোনো সমাজের উন্নয়নের জন্য মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সহযোগিতা ও সম্প্রীতি থাকা খুবই জরুরি। এটি মানবজীবনে ঐক্য ও শক্তি যোগায়। উভয় চিন্তাবিদই বিশ্বাস করেন যে মানুষের মধ্যে সীমাহীন গুণ, ক্ষমতা এবং ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যমান। যাতে সে তার মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে। একজনকে কেবল এই ক্ষমতাগুলি জানতে হবে। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতার উপর বেশি জোর দিয়েছেন, যাতে মানবধর্ম প্রাধান্য পায়। মানবতাবাদ সব ধর্মের সারাংশ।বিভিন্ন ধর্মের অন্তর্নিহিত সাধারণ উদ্দেশ্য হল মানুষের উন্নতি। উভয়েই মানবিক মূল্যবোধ ও মর্যাদায় দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি কোনোভাবেই মানুষকে অবমূল্যায়ন করতে চাননি, ঈশ্বরের মতো অলৌকিক শক্তির পরিবর্তে তিনি মানব সেবাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ধর্মের বিকল্প পথ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। মানুষ এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব, যার পূর্ণ বিকাশে যা কিছু বাধাগ্রস্ত হয়, তা অবজ্ঞার যোগ্য।কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারণা আছে, যা ব্যক্তিগতভাবে উপযুক্ত বলে মনে হয় না। উভয় দার্শনিকই ধর্মকে মানুষের উন্নতির অন্তরায় হিসেবে দেখেন। শুধুমাত্র ধর্মের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। হিন্দু ধর্ম, ইসলাম, খ্রিস্টান, জৈন বা অন্য যেকোন ধর্মই হোক না কেন, সকলেরই লক্ষ্য মানবজাতির কল্যাণ করা কারণ রায় বিশ্বাস করেন যে, মানুষ প্রকৃতিতে যুক্তিবাদী তাই এটি ধর্মের মৌলিক অর্থ উপলব্ধি করতে পারে। সার্ত্রে তার দর্শনে ধর্মীয় ধারণার প্রতি অবহেলার অনুভূতি রেখেছেন, কিন্তু এই ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব পুরোপুরি বোঝা যায় না। শুধু ধর্মের ইতিবাচক দিক থেকে এবং নেতিবাচক দিক থেকে, এটি মানব জীবনের প্রতিবন্ধক বলা যাবে না।

রায়ের দর্শন রাজনৈতিক চেতনায় অনুপ্রাণিত ছিল। তিনি নব্য মানবতাবাদের দর্শন তুলে ধরেন, কিন্তু মার্কসবাদী চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসতে পারেননি। রায় ভারতের সমসাময়িক সামাজিক সমস্যার গভীর অধ্যয়ন করেছেন, কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট সমাধান দিতে অক্ষম হয়েছেন। তিনি যে বিন্যাসটি উপস্থাপন করেছিলেন তার ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব ছিল। তাঁর রাজনৈতিক জীবন নেহেরু ও গান্ধীর চেয়ে বেশি সফল ছিল। কিন্তু তিনি তাঁর চিন্তাধারা দিয়ে জনগণের মনকে প্রভাবিত করতে পারেননি।

সার্ত্রে বিশ্বাস করেন যে মানুষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং দায়িত্বশীলও, কিন্তু মানুষের পথে অনেক পরিস্থিতি এবং বাধা আসে, যার কারণে একজন ব্যক্তি তার সমস্ত পরিকল্পনা এবং সম্ভাবনা পূরণ করতে সক্ষম হয় না। তার দর্শন মানব জীবনের কিছু অংশের রূপরেখা দেয়, মানব অস্তিত্বের সামগ্রিক তত্ত্ব নয়।

অতএব, এটা স্পষ্ট যে এই প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য ছিল মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং জা পল সার্ত্রের মানবতাবাদী ধারণাগুলির একটি তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা। যাতে মানুষের অস্তিত্ব, অহংকার এবং তার কল্যাণকে আবার গুরুত্ব দেওয়া যায়। এবং এর লক্ষ্য হল মানুষের স্বাধীনতার কেন্দ্রবিন্দু প্রতিষ্ঠা করা এবং এই পৃথিবীতে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন বজায় রাখা। উভয় দার্শনিকই এই লক্ষ্য পূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। মানবতাবাদী সমর্থক হওয়ার কারণে তারা এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করতে চেয়েছিলেন যা মানুষ ছাড়া অন্য কোনো শক্তিকে গুরুত্ব দেয় না, শুধুমাত্র মানুষের সর্বাত্মক বিকাশ ঘটাতে পারে। বিশিষ্টতা এই সত্য কখনো অস্বীকার করা যাবে না

এটা সম্ভব যে এই মহাবিশ্বে, মানুষ অন্যান্য জীবের চেয়ে সর্বোত্তম। তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা, ক্ষমতা এবং সীমাহীন সম্ভাবনাগুলি জানতেন, যার ভিত্তিতে ব্যক্তি নিজেকে এবং সমাজকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সার্ত্র তিনি প্রধানত একজন লেখক এবং তিনি একজন নাট্যকার ছিলেন, এ কারণে তার দর্শনে রাজনৈতিক চিন্তার কোনো স্পষ্ট প্রকাশ নেই। কিন্তু তার সৃজনশীল কাজ এবং সাহিত্য প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি মানুষের সাথে সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করেছেন। অন্যদিকে, মানবেন্দ্রনাথ রায় একজন প্রধান রাজনৈতিক চিন্তাবিদ হিসেবে বিখ্যাত। তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গভীর অধ্যয়ন করেছেন এবং এর মাধ্যমে একটি নৈতিক সমাজের রূপরেখাও উপস্থাপন করেছেন, যুক্তিবাদী ব্যক্তিদের দ্বারা সৃষ্ট একটি নৈতিক সমাজের কল্পনা উপলব্ধি করা যেতে পারে, যেখানে কোনো ধরনের কাল্পনিক শক্তির হস্তক্ষেপ থাকবে না, কারণ মানুষ তার বিবেক থেকে স্বাধীন এবং নৈতিকভাবে এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা তৈরি করতে সক্ষম যেখানে রায়ের নব্য মানবতাবাদ মানবিক মূল্যবোধ, ভালবাসা, দয়া, সহযোগিতা, সমতা এবং ব্যক্তির মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে তার মূর্ত রূপ অর্জন করতে পারে। এটি সার্ত্রের অস্তিত্ববাদের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা নয়, তার অস্তিত্ববাদী দর্শনে মানুষের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। মানুষের অস্তিত্বের বিশ্লেষণে কোথাও ঈশ্বরের স্থান নেই। অবশ্যই বিভিন্ন ধরণের মনোভাব রয়েছে, যা মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য অংশ। এসব অভিজ্ঞতা নিয়ে বেঁচে থাকা মানেই মানুষ হওয়া, এটাই প্রমাণ করে মানুষের সভ্যতা। মানুষের অস্তিত্বকে কোনো স্থির বা সাধারণ সূত্রে বাঁধা যায় না কারণ মানুষ ক্রমাগত নিজের সিদ্ধান্তে তার রূপ সৃষ্টি করে চলেছে। তিনি তার কর্মের মাধ্যমে রূপ নির্ধারণ করেন। এই সংস্কার সম্পূর্ণরূপে বিচারের স্বাধীনতার উপর ভিত্তি করে। মানুষ স্বাধীন হতে হবে এর মূল আকার সহজাত যে কোনো ধরনের স্বাধীনতা মানবতাবাদের কোনো অবদান নেই। উভয় চিন্তাবিদদের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের স্বার্থের জন্য খুব দরকারী বলে মনে করা যেতে পারে।

মানুষ মানবতাবাদী চিন্তা প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই বর্তমান সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধর্ম, জাতিভেদ, আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে উঠে এ ধরনের সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেখানে সমস্ত মানবজাতির কল্যাণ জড়িত, সেখানে স্পষ্টতই সেই নিয়মগুলি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যা স্বাধীনতা, সাম্য, প্রেম, দয়া এবং সহানুভূতি ইত্যাদির মূল্যবোধকে প্রচার করে।

মানবতাবাদ এমন একটি দার্শনিক পদ্ধতি যাতে একজন ব্যক্তি সুখী, সমৃদ্ধ এবং জীবনযাপন করতে পারে। শান্তিপূর্ণ জীবন, এটি মানুষের মর্যাদাকে সর্বোচ্চ মূল্য হিসেবে গ্রহণ করে। মানবতাবাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল এই পৃথিবীর কথা বিবেচনা করে মানবজীবনকে উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হতে সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রাণিত করা এবং উৎসাহিত করা। এই অভিজ্ঞতা বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও যুক্তির ভিত্তিতে একজন মানুষের

বর্তমান জীবনকে আনন্দময় করে তোলার চেষ্টা করে। মানবজাতি শুধুমাত্র এই জগৎ ও বর্তমান জীবনকে জানতে বা বুঝতে পারে, সেজন্য স্বর্গ-নরকের মতো কোনো কাল্পনিক জীবন নিয়ে তাদের চিন্তা করা উচিত নয়। তাদের এই ধরনের অকেজো চিন্তা পরিহার করা উচিত। মানুষের জ্ঞান সীমিত, সে কেবল তার কাজের মাধ্যমে নিজের এবং অন্যের জীবনকে উন্নত করতে পারে। জাতিভেদ, বর্ণবৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা, অস্পৃশ্যতা, তিক্ততা, বিদ্বেষ, সামাজিক বিভেদ, সহিংসতার মতো সমাজে বিরাজমান মন্দতায় মানবজাতি। উদ্বিগ্ন। প্রকৃত অর্থে মানবতাবাদ মানুষকে কেন্দ্রবিন্দু মনে করে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ চায়।

বিশ্ব ও মানুষের সমস্যার কথা মাথায় রেখে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আজকের প্রেক্ষাপটে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক যা মানুষকে তাদের জীবনকে আনন্দময় করতে সাহায্য করবে। এই জগৎ অধ্যয়ন এটিকে ভবিষ্যতে বিপর্যয়কর পরিণতি থেকে রক্ষা করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। আমার মতে, সমসাময়িক ভারতীয় দর্শনের বিখ্যাত মানবতাবাদী চিন্তাবিদ মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং মহান চিন্তাবিদ জা পল সার্ত্র। সমসাময়িক পাশ্চাত্য দর্শনের, প্রতিষ্ঠিত মানব কল্যাণ। যে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে তা অভ্যন্ত প্রশংসনীয়। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে কখনোই উপেক্ষা করা যাবে না।

তথ্যসূত্র:

1) JeanPaul, Sartre. Existentialism and Humanism, translated by Philip Mairet.London:Mathuen and Co.Ltd,1948.
2) Varma, V.P.Philosophical Humanism and Contemporary India.Varanasi:Motilal Banarasidass Publishers Private Limited,1979.
3) Bhadra,Mrinal Kanti.A Critical Survey Of Phenomenology and Existentialism.Indian Council of Philosophical Research, in association with Allied Publishers,1990.
4) Reynolds, Jack and Churchill, Steven.Jean-Paul Sartre: Key Concepts, New York: Routledge, 2014.
5) ভদ্র, মৃনালকান্তি.জাঁ পল্ সার্ত্রের সত্তা ও শূন্যতা, কলকাতা:বিজ্ঞাপনপর্ব,2000.
6) চাকমা,নীরুকুমার. অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা.ঢাকা: বাংলা একাডেমি, 1983.
7) বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল কুমার. বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য দর্শন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক, 1984.
8) সরকার, স্বপ্না. অস্তিবাদী দর্শন ও প্রতিভাস বিজ্ঞান. কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,2016.
9) রায়, মানবেন্দ্রনাথ. মানবতাবাদী পথ, সম্পাদক মনোজ দত্ত. কলকাতা: রেনেসাঁস পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, 1988.
10) রায়, মানবেন্দ্রনাথ. নব মানবতাবাদ, অনুবাদক স্বদেশরঞ্জন দাস.কলকাতা: জিজ্ঞাসা,1963.
11) রায়,সমরেন.মানবেন্দ্রনাথ রায় জীবন ও দর্শন.কলকাতা: দেশ পাবলিশিং,1958.
12) Ray,Sibnarayan.M.N.ROY Philosopher-Revolutionary, Calcutta:Renaissance Publishers (Pvt.) Limited,1984.
13) Roy,M.N.New Humanism A Manifesto.Delhi:Ajanta Publications,1981.
14) Roy,M.N. Materialism An outline of the History of Scientific Thought.Calcutta:Renaissance Publishers (Pvt.) Limited,1951.

15) Dr.Ramendra.M.n.Roy's New Humanism and Materialism.Patna:Buddhiwadhi Foundation,2001.
16) Bhattacharya, Gopinath.M.N.ROY and Radical Humanism.Bombay:A.j.b.wadia publication,1961.
17) Roy,Samare.M.N.ROY,A Political Biography.Orient Black Swan,1997.